বায়ান্ন থেকে একাত্তর

সেলিনা হোসেন

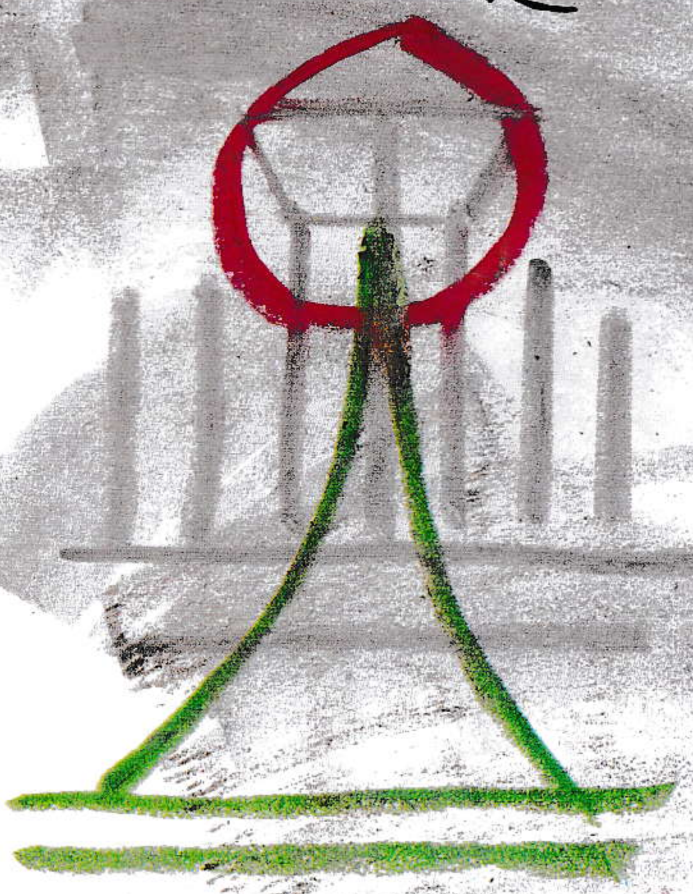

বায়ান্নো থেকে একাত্তর

সেলিনা হোসেন

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক

পঞ্চম মুদ্রণ
জুন ২০১১
চতুর্থ মুদ্রণ
মে ২০১১
তৃতীয় মুদ্রণ
আগস্ট ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ২০০৮
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

অলংকরণ
উত্তম সেন

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

দাম
আশি টাকা মাত্র

I S B N 984 410 474 2

BAHANNO THEKE EKATTOR : (From Language Movement to Liberation War) by Selina Hossain. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers. 39, Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury & Illustration by Uttam Sen. Price : Taka Eighty only.

উৎসর্গ

এই বই অবিস্মরণীয় বালক ইমন ও তাঁর মতো অসংখ্য ছেলেমেয়ের জন্য

কবি নির্মলেন্দু গুণের বাসায় ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে ইমনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। গুণের কম্পিউটার টেবিল থেকে কাগজের একগুচ্ছ ছোট ছোট পতাকা উঠিয়ে নিয়ে যায় ও। বাড়ির দেয়ালে সেগুলো আঠা লাগিয়ে সেঁটে দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপন করবে।

সে সময়ে ওর মাসী কল্পনা একটি কাপড়ের বড় পতাকা নিয়ে ঘরে ঢোকে। প্রতিবছর কল্পনা ওকে একটি পতাকা কিনে দেয়। বিজয় দিবসে ও নিজের বাড়িতে বাঁশের মাথায় পতাকা উড়িয়ে দেয়। এ বছরে মাসীর কাছে পতাকা চাইলে কল্পনা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, আমি রাজাকার হয়ে গেছি। আমি আর পতাকা কিনব না। ইমন মাসীকে বলেছিল, তুমি পতাকা না কিনলে, দেখবে সন্ধ্যায় আমার জ্বর আসবে।

কাজের ব্যস্ততায় সারা দিনে কল্পনার পতাকা কেনা হয় না। সন্ধ্যার পরেই ইমন শুয়ে পড়ে। ওর প্রবল জ্বর এসেছে। ওর মা জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ তোমার এমন জ্বর এলো কেন বাবা? ইমন কাঁদতে কাঁদতে বলে, মাসী রাজাকার হয়েছে। আমার জন্য আর কোনোদিন পতাকা কিনবে না।

ইমনের জ্বর দেখে রাতেই পতাকা কিনে আনে কল্পনা। ও তখন ঘুমিয়ে গেছে।

সকালে কল্পনা যখন এসব কথা বলছিল তখন ইমন আবার ঘরে ঢোকে। কল্পনা ওকে পতাকা দেয়। ইমন হাসতে হাসতে বলে, দেখো আমার জ্বর ছেড়ে গেছে।

আমি অবাক হয়ে ইমনের দিকে তাকিয়ে থাকি। এই দুঃসময়ের বাংলাদেশে এমন ছেলেও আছে!

ছোট্ট বন্ধুরা, আমরা জানি তোমরা সবাই ১৯৫২ এবং ১৯৭১ সালের কথা শুনেছ। এ সাল দুটো আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ-সময়ে আমরা দুটো গৌরবময় অর্জনের কৃতিত্ব লাভ করেছিলাম। ১৯৫২ সালে আমরা আমাদের মাতৃভাষার জন্য লড়াই করে জিতেছিলাম। আর ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে জিতেছিলাম। এই দুই লড়াইয়ের ধরন ছিল দু'রকম। ভাষার জন্য আমাদের লড়াই ছিল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের। সভা-সমিতি এবং মিছিল-স্লোগানের লড়াইয়ে জিতেছিল বাঙালি। আর স্বাধীনতার জন্য আমাদের লড়াই ছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সে-সময়ে বাংলার দামাল ছেলেমেয়েরা 'জয় বাংলা' রণধ্বনি দিয়ে অস্ত্রহাতে পাকিস্তানি সেনার সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ে অকাতরে জীবন দিয়ে জিতেছিল। দু'টো বড় অর্জনে এমন অন্যরকম জেতা আমাদের ইতিহাসের অসাধারণ ঘটনা। এই উপমহাদেশে এমন যুগান্তকারী ঘটনা অন্য কোনো দেশের ইতিহাসে নেই।

আমরা বাঙালি জাতি। বাংলা আমাদের ভাষা। বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা বাংলাদেশী। কোনো মানুষই তার জাতিসত্তা বদল করতে পারে না,

বদল করতে পারে তার নাগরিকত্ব। তোমাদের কেউ যদি কোনোদিন ইংল্যান্ডে গিয়ে বাস করতে চাও তা হলে তোমরা ইংল্যান্ডের নাগরিক হতে পারবে, কিন্তু কখনো ইংরেজ হতে পারবে না। তেমনি কোনো-একজন বিদেশী যদি বাংলাদেশে এসে থাকতে চায় তা হলে সে বাংলাদেশী হতে পারবে, নাগরিকত্ব নিয়ে—কিন্তু কোনোদিনই বাঙালি হতে পারবে না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও বাঙালি আছে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে এবং আসামেও বাঙালি আছে। তারা জাতিসত্তায় বাঙালি, কিন্তু নাগরিকত্বে ভারতীয়। আরও একটি বিষয় তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে একজন মানুষ ইচ্ছে করলে তার ধর্ম বদলাতে পারে। যেমন একজন হিন্দু মুসলমান হতে পারে কিংবা একজন সাঁওতাল খ্রিস্টান হতে পারে। কিন্তু এটা সত্যি যে একজন বাঙালি ইচ্ছে করলেই যেমন চাকমা হতে পারবে না, তেমনি একজন সাঁওতাল খ্রিস্টান হলেই ইংরেজ হতে পারবে না। জাতিসত্তা এমন গভীর বিষয়। তা হলে ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারছ যে জাতিসত্তা এবং নাগরিকতা এক বিষয় নয়। সুতরাং বাঙালি এবং বাংলাদেশী নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। আমরা সহজেই বুঝে যাই যে কীভাবে আমরা বাঙালি এবং কীভাবে আমরা বাংলাদেশী।

এই বাঙালি জাতির হাজার বছরের পুরনো ভাষা বাংলা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে রাজপথে জীবন দিয়েছিল আমাদের তরুণ ছেলেরা। ভাষা-আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল নারী-পুরুষসহ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

১৯৪৭ সালে দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয় ভারতবর্ষ। স্বাধীনতা লাভ করে উপমহাদেশের মানুষ। ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে যে-নতুন রাষ্ট্রটির জন্ম হয় তার নাম পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুটো অংশ ছিল—পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের আগের নাম ছিল পূর্ববাংলা। পূর্ববাংলায় বাস করত বাঙালিরা। পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল চারটি প্রদেশ। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব ছিল প্রায় বারোশ মাইল। এই দুই অংশের

মাঝখানে আছে ভারতের বিশাল এলাকা। আকাশপথে বা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে জাহাজে করে যাওয়া ছাড়া অন্যভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল না। পাকিস্তানের অন্য যে-কোনো প্রদেশের চেয়ে বাঙালিরা ছিল জনসংখ্যার দিক থেকে বেশি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির মুখের ভাষাকে উপেক্ষা করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। এ সময়ে পরিষদ পরিচালনার নিয়মকানুন তৈরি করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে গণপরিষদের আলোচনায় ইংরেজি এবং উর্দু ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলা যাবে না। পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি গণপরিষদ পরিচালনার এই নিয়ম মানতে পারলেন না। তিনি একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করলেন। বললেন, ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও গণপরিষদের ভাষা করতে হবে। তিনিই প্রথম বাঙালি ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি যিনি ভাষার প্রশ্নে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। কিন্তু বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা করার দাবি মানা হয়নি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে তাঁর কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। কুমিল্লা সেনানিবাসে তাঁকে বন্দি করে রাখে। ভীষণ অত্যাচার করে। এরপর তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সে সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাশি বছর। তিনি একজন মহান বাঙালি। শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অমর হয়ে থাকবেন আমাদের ইতিহাসে।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়দে আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ১৯ মার্চ তাঁকে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় ঢাকার কার্জন হলে ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চলতে থাকে।

বাঙালির প্রতিরোধ-আন্দোলন দমন করার জন্য সে-সময়ের পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্রদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, তিনি বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণ-পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি এই চুক্তি ভঙ্গ করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিনি আবার ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

এই ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে প্রতিরোধ-আন্দোলন উত্তাল করে তোলে। ঠিক হয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক সরকারের বাজেট অধিবেশন যখন শুরু হবে তখন তারা মিছিল করে সেখানে গিয়ে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাবে। এর আগের দিনগুলোতে তারা প্রতিদিন কোনো-না-কোনো কর্মসূচি করে প্রতিবাদ জানাতে থাকে।

ছাত্রছাত্রীদের এই প্রতিরোধ-আন্দোলনে ভয় পেয়ে প্রাদেশিক সরকার ২০ তারিখ রাতে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি।

ছাত্ররা সকালবেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে জড়ো হয়। তারা ঠিক করে যে দশজন দশজন করে একটি মিছিল বের করবে। তা হলে ১৪৪ ধারা ভাঙার অপরাধে দণ্ডিত হতে হবে না। সেই অনুযায়ী মিছিল বের হতে থাকে। মেয়েদেরও একটি মিছিল বের হয়। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিছিলে অংশগ্রহণ করে অগণিত সাধারণ মানুষ। দিন যত বাড়তে থাকে মিছিলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা তত বাড়তে থাকে।

বিকেলের দিকে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। নিহত হন বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, আউয়াল ও অহিউল্লাহ সহ আরও অনেকে। পুলিশ অনেকের লাশ সরিয়ে ফেলে। পরদিন এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশাল মিছিল বের হয়। পুলিশ আবার গুলি চালায়। নিহত হন শফিউর রহমান। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রাণ দেন ছাত্র ও সাধারণ মানুষ। এমন কোনো দেশ ছিল না, এমন কোনো জাতি ছিল না যারা মায়ের ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়ার এমন নজির স্থাপন করেছিল। তারপরও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চার বছর ব্যয় করে পাকিস্তান সরকার। ১৯৫৬ সালে বাংলাভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়ে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের জানতে হবে যে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলন আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার দিকে যাত্রা করে। দেখা যাক ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা কারা, তাঁদের পরিচয় কী। বরকত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রফিক ছিলেন প্রেসের মালিক। শফিউর রহমান ঢাকা হাইকোর্টের হিসাবরক্ষণ শাখায় চাকরি করতেন। সালাম ছিলেন সরকারি অফিসের পিয়ন। কৃষক পরিবারের সন্তান আবদুল জব্বার বার্মায় কিছুদিন চাকরি করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। আবদুল আউয়াল ছিলেন রিকশাচালক। কিশোর অহিউল্লাহ ছিলেন রাজমিস্ত্রী হাবিবুর রহমানের ছেলে। তোমরা খেয়াল করে দেখ ছোট্ট বন্ধুরা, যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের সবাই এক একজন এক এক ক্ষেত্র থেকে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সবাই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না। ভাষা

রাষ্ট্রভাষা
বাংলা
চাই

আন্দোলন শুধুই ছাত্রছাত্রীরা করেনি। এভাবে সকলের মিলিত প্রয়াসে ভাষা আন্দোলন সফল হয়েছিল।

তবে ছোট্ট বন্ধুরা, মনে রাখতে হবে যে ভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হলেও সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনকে নিজেদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে পরিণত করে। সেজন্য আমরা বলি বায়ান্নো থেকে একাত্তর। কিন্তু এর মাঝে আছে আরও উনিশ বছরের ইতিহাস। কারণ স্বাধীনতা হঠাৎ করে অর্জন করা যায় না। স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। চলো দেখা যাক আমরা কীভাবে উনিশ বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য আমাদের যাত্রাকে পরিচালিত করেছি।

ছোট্ট বন্ধুরা, চলো একটু পেছনে যাই। ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার কার্জন হলে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা।" এই বাস্তব কথাটি হল আমাদের জাতিসত্তার মূলকথা। সে-সময়ে এই ভূখণ্ডের নাম ছিল পূর্ববাংলা। ১৯৫৬ সালে সরকারিভাবে এই ভূখণ্ডের নাম করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান পার্লামেন্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্পিকারকে বলেছিলেন, 'সরকার পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান রাখছে। আমরা দাবি করছি আমরা 'বাংলা' নাম রাখতে চাই।' এই পূর্ববাংলা নিয়ে এক গভীর আশার কথা বলেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, মনীষী এস ওয়াজেদ আলী। তিনি ১৯৪৩ সালে বলেছিলেন, "বাঙালির, তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ভবিষ্যৎ আশার কেন্দ্র হচ্ছে এই পূর্ববঙ্গ। যথাসময়ে প্রকৃত বাঙালি রাষ্ট্র এবং সমাজজীবন যে পূর্ববঙ্গের উর্বর ভূমিতেই মূর্ত হয়ে উঠবে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।" এভাবে বাংলাদেশের জন্মের একটি সূচনা তৈরি হয়ে উঠতে দেখি আমরা।

বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের আর একটি মোড় পরিবর্তন হয় ১৯৫৪ সালে। এই সময়ে স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারকে পূর্ববাংলার মাটি

থেকে উৎখাত করার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই একুশ দফার ১৮ নং ধারায় বলা হয়েছিলো "২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।" ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা জানো শহীদ দিবস ও শহীদ মিনার আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরব। আমরা আমাদের সংকটে-সংগ্রামে উজ্জীবিত হয়ে ওঠার জন্য শহীদ মিনারে গিয়ে শপথ গ্রহণ করি। যাহোক, এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা বিজয়ী হয়ে বিপুল সাফল্য অর্জন করে। ১৯৫৪ সালে ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির এই বিজয় সহ্য করতে পারে না। ক্ষমতায় বসার মাত্র ১ মাস ২৭ দিন পরে ৯২-ক ধারা জারির মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হয়। পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়। ৯২-ক ধারা হল ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ সরকার-প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের অংশবিশেষ। এই ধারাবলে সরকার নির্দিষ্ট অভিযোগ এনে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল করে গভর্নরের শাসন বহাল করতে পারে।

এই পরিস্থিতির ফলে এদেশের আপামর জনসাধারণ বুঝতে পারে যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব পূর্ব বাংলার বাঙালিদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। এদেশের মানুষ নিজেদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করে যে-রায় দিয়েছিল সেটা উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে তাদেরকেই অবজ্ঞা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এরপর ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা দখল করে। সামরিক শাসনের দমন-নিপীড়ন সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। গণবিরোধী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে প্রথম আন্দোলন শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। তিনটি ধারায় ছাত্রছাত্রীরা এই আন্দোলন পরিচালনা করে। '৬২ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের

প্রতিবাদ জানানো হয়। দ্বিতীয়ত আইয়ুব খান যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় মার্চ মাস থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। তৃতীয়ত আইয়ুব খান যে শিক্ষা কমিশন প্রবর্তন করেছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। প্রায় পুরো বছরই ছাত্রসমাজ আন্দোলন করে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন সবচেয়ে জোরালো হয়। শত শত শিক্ষার্থী জেলে যায়। অসংখ্য জন আহত হয় এবং আহতদের কেউ-কেউ মারা যায়। এই আন্দোলন শিক্ষা আন্দোলন নামে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসে মর্যাদার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আছে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনে সামরিক শাসনের ভিত নড়ে উঠে। ছাত্রছাত্রীরা এই সময়ে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করার দাবি উঠিয়েছিল।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাজনীতিবিদরাও নানা ধরনের কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। পূর্ববাংলায় এই আন্দোলন দমন করার জন্য পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। তার মধ্যে দাঙ্গা একটি। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় কাশ্মীরের মসজিদে রক্ষিত হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর কেশ চুরির সাথে হিন্দু কাফেররা জড়িত। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া। কিন্তু জনগণ এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে এবং দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা পালন করে। ৭ জানুয়ারি থেকে দাঙ্গা শুরু হয়। শত শত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১০ জানুয়ারি দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৫ জানুয়ারি হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচাতে গিয়ে বিশিষ্ট সংস্কৃতিকর্মী ও সমাজসেবী আমীর হোসেন চৌধুরী দাঙ্গাকারীদের হাতে নিহত হন। ১৬ জানুয়ারি বিহারিদের আক্রমণে নিহত হন নটরডেম কলেজের অধ্যাপক ফাদার নোভাক। ১৬ তারিখে ইত্তেফাক অফিসে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই কমিটি একটি ইশতেহার প্রচার করে। তাতে লেখা ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'। এই ইশতেহারে খুব কাজ হয়। মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। দাঙ্গা দমন হয়।

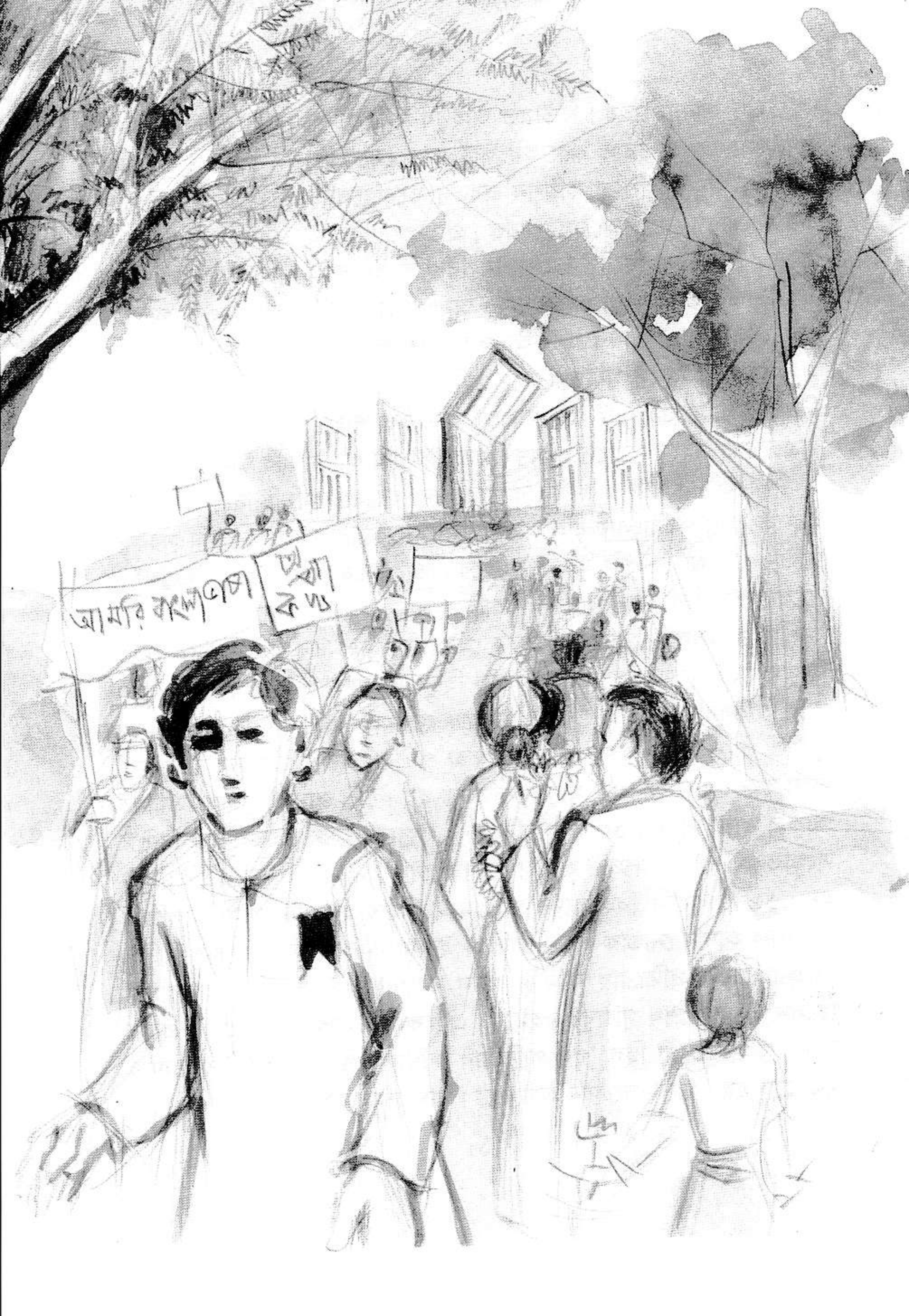
আমরি বাংলাভাষা

১৯৫০ সালে এমন একটি ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল এ দেশে। সে-সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন, "আমি কোরান হাদিস পড়েছি, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, কেউ যদি কোরান কিংবা হাদিস থেকে দেখাতে পারে যে নিরীহ এবং নিরস্ত্র হিন্দুদেরকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ তবে আমি তার দাসত্ব স্বীকার করব।" একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের মুখ থেকে যখন এমন কথা উচ্চারিত হয় তখন বুঝতে হবে যে আবহমানকালের বাঙালি এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করেছে এবং নিজের জীবন দিয়েও তাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেছে। এটাই বাঙালির বৈশিষ্ট্য এবং একে লালন করেই বাঙালি তার নিজের লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়েছে।

পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলার ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে পূর্ববাংলাকে শোষণ করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন করলেও পূর্ব পাকিস্তানে তারা তেমন কিছুই করেনি। দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন দেশের অর্থনীতিবিদরা। বাঙালি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে ৬-দফা নিয়ে উপস্থিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে পাকিস্তানের সম্মিলিত বিরোধীদলের সভায় তিনি ৬-দফা প্রস্তাব পেশ করেন। পূর্ববাংলার মানুষ এই ৬-দফাকে তাদের মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। এটি ছিল স্বাধীনতার স্মারক চিহ্ন। বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফায় পাকিস্তানে দুটি আলাদা মুদ্রার প্রস্তাব করেন। আইয়ুব খান ৬-দফার সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'ইহা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি পরিকল্পনা।' কিন্তু পূর্ববাংলার মানুষ তখন লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছে, এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি। তারা আর কোনো বাধা মানতে রাজি নয়।

এদিকে বাঙালির এই জগরণে আইয়ুব খান ক্ষেপে ওঠেন। শুরু হয় শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর দলের অসংখ্য কর্মীর ওপর নির্যাতন। এর প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন পূর্ববাংলায় হরতাল ডাকা হয়। পুলিশ গুলি চালায়।

সরকারি হিসাবমতে নিহত হয় দশ জন। এতেই বোঝা যায় যে বাঙালি ৬-দফার পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।

এর পরের বছর ১৯৬৭ সালের ২৩ জুন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করা হবে। এর আগে ১৯৬৬ সালেও একবার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কিন্তু জনগণের দাবির মুখে তা আবার চালু করা হয়। এবারও মানুষ আবার বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এবারও জনগণের চাপের মুখে তথ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

কিন্তু সরকার দমননীতি চালানো বন্ধ করে না। নতুন চাল দিতে শুরু করে। এর অন্যতম ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন সরকার 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'র বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জশিট দাখিল করে।

মামলা দায়ের করার পরপরই ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলের শহরে পরিণত হয় ঢাকা। কুর্মিটোলা সেনানিবাসের ভেতরে যখন চলছিল বিচার, তখন বাইরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল মানুষ।

১৯৬৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে মওলানা ভাসানীর ঘেরাও আন্দোলন শুরু হয়। এই পর্বের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় পাবনায়। পাবনা টাউন হল ময়দানে জনসভায় ভাষণদানের পরে তাঁর নেতৃত্বে বিশাল মিছিল পাবনার ডেপুটি কমিশনারের বাড়ি ঘেরাও করে। শুরু হয় গণআন্দোলনের প্রবল জোয়ার।

১৯৬৯ সালে ৪ জানুয়ারি ছাত্রসমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ১১-দফা কর্মসূচি পেশ করে। শুরু হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি। ৮ জানুয়ারি ৮-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে বিরোধীদলগুলো একজোট হয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। সংক্ষেপে এই পরিষদের নাম ছিল 'ডাক'।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা ভাবতেই পারবে না যে সে-সময়ে কেমন প্রতিবাদী শহরে পরিণত হয়েছিল তোমাদের প্রিয় শহর ঢাকা। প্রতিদিন মিছিল আর সভা অনুষ্ঠিত হতো। হাজার হাজার মানুষ এইসব সভায় অংশগ্রহণ করে। শুধু ঢাকা নয়, আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববাংলার সব জেলায়। গ্রামে, মফস্বল শহরে সবখানে মানুষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। কেউ কাউকে ডাকেনি, মিছিলে যেতে বলেনি। মানুষ নিজের ইচ্ছায়, প্রাণের তাগিদে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সেটা একটা অবিস্মরণীয় সময় ছিল পূর্ববাংলার মানুষের জন্য। এই আন্দোলন 'উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান' নামে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

আন্দোলন এত গতি পায় যে, পাকিস্তান সরকার ভীত হয়ে পড়ে। সে সময়ে যারা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা বলতেন, কুর্মিটোলার যেখানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার কাজ চলছিল মিছিলের মাথা থাকত সেখানে, আর শেষের অংশ থাকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। এত বড় ছিল মিছিলের আকার। গণজোয়ারে ভেসে যেত রাজপথ। এর জের ধরে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়।

২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে রাজপথে শহীদ হন অন্যতম ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান। এর ফলে পাল্টে যায় আন্দোলনের চরিত্র। বিপুল-বিশাল আকার ধারণ করে তা। ২২ জানুয়ারি 'সংবাদ' পত্রিকা লিখেছিল, "পল্টন ময়দানে শহীদ আসাদুজ্জামানের গায়েবানা জানাজা পাঠ শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে প্রায় এক লক্ষ লোকের একটি বিশাল মিছিল সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলের পুরোভাগে শহীদ আসাদুজ্জামানের একটি রক্তমাখা সার্ট বহন করা হয়। ... স্মরণকালে এতবড় গণ মিছিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়নি। এই বিশাল গণমিছিলের দৃপ্ত পদভারে ও বজ্র নির্ঘোষ আওয়াজে ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। মিছিল যতই অগ্রসর হতে থাকে এর কলেবরও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। পথিপার্শ্বস্থ গৃহসমূহের ছাদ ও জানালা হতে মিছিলকারীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়।"

২৪ জানুয়ারি ঢাকা শহরে যে ঘটনা ঘটে তা ছিল অসাধারণ, অভূতপূর্ব। এ-কারণে এ-দিনটিকে 'গণ-অভ্যুত্থান' দিবস বলে অভিহিত করা হয়। এদিন মানুষের ঢল প্লাবিত করে ফেলে রাজপথ। মিছিলে গুলিবর্ষণ করে সেনাবাহিনী। নিহত হয় নবকুমার ইন্সটিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান। গণ-জমায়েতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মতিউরের বাবা বলেন, "এক মতিউরকে হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিউরকে পেয়েছি।"

১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে সেনানিবাসের ভেতরে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে পাকিস্তানি সেনারা বেয়োনেট চার্জ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে হত্যা করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ছেড়ে রাজপথে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। ওদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে পথরোধ করে পাকিস্তানি সেনারা। ওদের উঁচিয়ে ধরা রাইফেলের সামনে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা বলেছিলেন, আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রদের গায়ে গুলি লাগার আগে সেটা আমার গায়ে লাগবে। তাই হয়েছিল। ড. জোহাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে কবর দেয়া হয়েছিল। সেদিন এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে মানুষ কারফিউ উপেক্ষা করে ঢাকার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর বন্দুকের নলের সামনে বীরদর্পে এগিয়ে যায় মানুষ। সেদিন মানুষের মৃত্যুভয় ছিল না। মৃত্যুকে তুচ্ছ করার এমন দুর্বিনীত সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল শাসকগোষ্ঠী।

পল্টন ময়দানের জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন, শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

পরিস্থিতি সামলানোর বাইরে চলে যায়। উপায় না দেখে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে অভিযুক্তদের বিনা শর্তে মুক্তি দেয়। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আবার

সামরিক শাসন জারি হয়। ক্ষমতায় আসেন জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান।

উনসত্তরের প্রবল গণ-অভ্যুত্থান আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে আসে। পূর্ববাংলার মানুষ বুঝতে পারে তাদের পিছু হটা চলবে না। অধিকার আদায়ের জন্য সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায় পূর্ববাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোর উপর দিয়ে। মারা যায় প্রায় দশ লক্ষ লোক। অনেক অঞ্চল ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ-সময় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভীষণ অমানবিক আচরণ করে পূর্ববাংলার মানুষের সঙ্গে। এই দুর্যোগের আগে ঠিকমতো আবহাওয়া বার্তা প্রচার করা হয়নি। এমনকি জলোচ্ছ্বাস হয়ে যাওয়ার অনেক পরে সরকার উদ্ধারকাজ পরিচালনা এবং ত্রাণ বিতরণ শুরু করে। যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয় জানমালের। পূর্ববাংলার মানুষ সরকারের এই অমানবিক আচরণ মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। এর ফলে রাজনীতিতেও শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ প্রভাব পড়ে। মানুষের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে দেশের সরকার পূর্ববাংলার মানুষের ভালোমন্দের দিকে খেয়াল রাখে না।

এই বছরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মানুষ এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে। পূর্ব পাকিস্তানে মোট ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে ১৬০টি আসন। ২টি আসন পায় অন্যরা। এর ফলে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর এটা তো সত্যি, সংসদীয় ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই হন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং নির্বাচনে জিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এটা অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

কিন্তু এ সত্যকে মানতে পারল না পাকিস্তানের শাসকরা। তারা বাঙালির হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করলো। শুরু হল রাজনীতির খেলা। প্রেসিডেন্ট ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১ মার্চ রেডিও পাকিস্তানের সব কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণে তিনি

বীর বাঙালি
অস্ত্র ধর
বাংলাদেশ
স্বাধীন কর
জয় বাংলা

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা এতই আকস্মিক ছিল যে মানুষ একদম হতভম্ব হয়ে যায়। কিন্তু এই হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠতে পূর্ববাংলাবাসীর সময় লাগে না। তারা বিক্ষোভে-বিদ্রোহে ফেটে পড়ে।

ছোট্ট বন্ধুরা, সেদিন ছিল সোমবার। সময় দুপুর ১-০৫ মিনিট। ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা চলছিল পাকিস্তান ও বিশ্ব একাদশের মধ্যে। মাঠের দর্শকরা রেডিওতে ক্রিকেটের ধারাবিবরণী শুনছিল। তাই রেডিওতে প্রেসিডেন্টের ঘোষণা তারাই প্রথমে শুনতে পায়। স্টেডিয়ামের হাজার হাজার মানুষ এই ঘোষণা শুনে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা 'জয় বাংলা' স্লোগানে স্টেডিয়াম মাতিয়ে তোলে। একদল দর্শক মাঠে ঢুকে ব্যাট, বল, স্ট্যাম্প, প্যাড ইত্যাদিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। হাজার হাজার মানুষের জঙ্গি মিছিল রাজপথে নেমে পড়ে। উত্তেজিত জনতা প্রবল ঘৃণায় পাকিস্তানের পতাকা ও জিন্নাহর ছবি পুড়িয়ে ফেলে। এইদিন থেকে পাকিস্তান সরকারের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানে চলতে থাকে বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসন। দেশ চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে এক সভায় ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত হয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। পতাকার রঙ ছিল সবুজ, মাঝখানে লাল সূর্য এবং তার উপরে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র।

৭ মার্চ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই দিন জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর হয়ে ঢাকায় আসেন। টিক্কা খান তার নিষ্ঠুর দমনপীড়ন আচরণের জন্য পাকিস্তান জুড়ে কুখ্যাত ছিলেন। পাকিস্তানের আর একটি প্রদেশ বেলুচিস্তানের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করার জন্য তাকে 'কসাই' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। তাকে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নর করে পাঠানোর উদ্দেশ্য মানুষ বুঝতে পারে। তারপরেও মানুষ ভয় পায় না। ১ মার্চ থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সারা দেশের মানুষ নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের জারীকৃত নির্দেশ মেনে চলতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বভার গ্রহণ করে টিক্কা খান সদম্ভে ঘোষণা করেন, 'পর্যাপ্ত পরিমাণ রণসম্ভার পেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বাঙালিদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেবেন।' ৯ তারিখে বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী গভর্নর টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন। উত্তাল হয়ে ওঠে মার্চের দিনগুলো। প্রতিদিন সমাবেশ, মিছিলের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে থাকে।

১৯ মার্চ জয়দেবপুরের মানুষ পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সে সময়ে জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজবাড়িতে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল। এই রেজিমেন্টের পঁচিশ-তিরিশ জন জওয়ান-অফিসার ছাড়া বাকিরা ছিলেন বাঙালি। তাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঢাকা ব্রিগেড সদর দফতর বাঙালিদের হাতে অস্ত্র না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্যসহ ব্রিগেড কমান্ডার জয়দেবপুর সেনানিবাসে আসেন। তার সেনানিবাসে আসার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর রটে যে বাঙালি সৈনিকদের অস্ত্র কেড়ে নিতে ঢাকা থেকে পাঞ্জাবি সেনারা এসেছে। জয়দেবপুরের হাজার হাজার মানুষ লাঠি, সড়কি, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে বাজারে জড়ো হয়। সমরাস্ত্র কারখানা ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস কারখানার শত শত শ্রমিক কর্মচারিরাও উত্তেজিত জনতার সঙ্গে যোগ দেয়। তারা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড তৈরি করে। রেলস্টেশন থেকে মালগাড়ির ওয়াগন এনে রেল ক্রসিংয়ের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবি সৈনিকরা বাঙালিদের ওপর গুলি ছোঁড়ে। কয়েকজন বাঙালি যুবক মারা যান। পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল বাঙালিদের প্রথম প্রতিরোধের ঘটনা। স্বাধীনতার পরে জয়দেবপুরের চৌরাস্তায় 'জাগ্রত চৌরঙ্গী' নামে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয় এই ঘটনার স্মরণে।

মার্চ মাসের দিনগুলোতে একদিকে চলছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা, অন্যদিকে চলছিল পাকিস্তার সরকারের যুদ্ধের জন্য গোপন প্রস্তুতি। আকাশপথে ও নৌপথে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনবরত সৈন্য ও গোলাবারুদ আনা হচ্ছিল। বাঙালিদের খতম করার উদ্যোগ নিয়েছিল পাকিস্তান সরকার।

একুশে মার্চ চারু ও কারুশিল্পীরা বুকে 'স্বা ধী ন তা' বেঁধে মিছিল করেন। ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু ছুটির দিন ঘোষণা করেন। এই দিন তিনি নিজ হাতে তাঁর বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন। এই দিন বাংলার ঘরে ঘরে, অফিস-আদালতে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে। এমনকি ঢাকায় অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসগুলিতেও ওড়ে বাংলাদেশের পতাকা। এই দিন ঢাকার দ্য পিপল পত্রিকা লেখে : A new flag is born. এইদিন সেনাবাহিনীর লোকেরা বাঙালি কর্মচারির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যায়। টেলিভিশনে পাকিস্তানি পতাকা দেখা যায়নি। জাতীয়সঙ্গীত শোনা যায়নি। এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ বলেছিলেন, 'একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের অস্তিত্ব নাই।' এইদিন প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

ছোট্ট বন্ধুরা, এরপর কেটেছে মাঝে একদিন। তার পরের রাতটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের একটি জঘণ্যতম গণহত্যার রাত। এরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঘুমন্ত নিরীহ বাঙালির উপর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড চালায়। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তারা যে নীলনকশা বানিয়েছিল তার নাম ছিল 'অপারেশন সার্চলাইট।' অন্যদিকে এ-রাত যোদ্ধা বানিয়েছিল বাঙালিকে।

এ-রাতে বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ইপিআর-ওয়ারলেসের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা, তখন ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। ফার্মগেটে তারা সাধারণ মানুষের তৈরি করা ব্যারিকেডের মুখোমুখি হয়। এটি ছিল সেনা কনভয়কে জনগণের প্রতিরোধ। তারপর রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সশস্ত্র প্রতিরোধের মোকাবেলা করে। পুলিশ লাইনের বাঙালি পুলিশরা

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের সময়ে নিজেদের সামান্য রাইফেল নিয়ে লড়াই করে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে বাঙালিদের দমন করা সহজ হবে না।

বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার আগে এই মর্মে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠান :

"This is my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

(এই-ই হয়তো তোমাদের জন্য আমার শেষ বাণী। আজকে থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। যে যেখানেই থেকে থাক, যে-অবস্থায় থাক, হাতে যার যা আছে, তা-ই দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলো। ততদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে, যতদিন পর্যন্ত না দখলদার পাকিস্তানিদের শেষ সৈনিকটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হচ্ছে।)

এই সময়ে চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রের কয়েকজন অসাধারণ সাহসী বেতার-কর্মী চট্টগ্রামের কালুরঘাটে একটি বেতার কেন্দ্র চালু করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবুল কাশেম সন্দীপ।

তিনি তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, '২৫ মার্চ রাত ১২টার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিক্লারেশন অব ওয়ার অব ইনডিপেন্ডেন্ট দেন। এই টেলিগ্রামটি প্রায় প্রত্যেক টেলিগ্রাম অফিসে পাঠানো হয়। এটিই ২৬ মার্চ বেলা ১.০০ টার মধ্যে ভাষণের মাধ্যমে বিপ্লবী নেতা এম.এ. হান্নান চট্টগ্রাম বেতার থেকে স্বকণ্ঠে প্রচার করেন। আর একই দিন, সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে'র মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রামটি আমি সংবাদ আকারে প্রচার করি।'

পঁচিশের রাত ১টার পরে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক বাহিনীর জীপে করে তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে আনা হয়। জেনারেল টিক্কাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে শেখ মুজিবকে তাঁর সামনে

আনা হবে কিনা। তিনি উত্তর দেন, I don't want to see his face. সে রাতে তাঁকে আদমজী স্কুলে রাখা হয়। পরদিন ফ্ল্যাগ স্টেশন হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনদিন পরে সেখান থেকে করাচি পাঠানো হয়।

গণহত্যার রাতের শুরুটা ছিল এমন, পঁচিশের রাত এগারটায় যখন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজনৈতিক আলোচনার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে চিন্তান্বিত তখন তার সবুজ রঙের টেলিফোনটি বেজে ওঠে। টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিলেন জেনারেল টিক্কা খান। তিনি বললেন, Khadim, it is tonight.

হ্যাঁ, এই সেই রাত যখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিলো শহর, একটি আধুনিক সেনাবাহিনী সাধারণ মানুষের রক্ত দিয়ে হোলির উৎসবে মেতে উঠেছিল এবং এই রাতেই সূচিত হয়েছিলো নিরস্ত্র বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ।

টিক্কা খানের ফোন পেয়ে মেজর জেনারেল খাদিম উত্তেজিত হননি। বরং এমন একটি নির্দের্শের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে দেন।

আক্রমণের সময় নির্ধারিত হয়েছিলো রাত ১টা। একযোগে একই সঙ্গে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। নির্দেশিত সময়ে ব্রিগেডিয়ার আরবারের বাহিনী নিম্নলিখিত কাজ করে :

ক. ১৩-সীমান্ত ফোর্স ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করবে এবং প্রয়োজন হলে ক্যান্টনমেন্ট রক্ষার জন্য প্রতিরোধ করবে।

খ. ৪৩-লাইট এ্যান্টি এয়ারক্রাফট রেজিমেন্ট, যারা ভারতের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ হবার পর থেকে বিমানবন্দরের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিলো, তারা বিমানবন্দর এলাকার দায়িত্বে থাকবে।

গ. মার্চের প্রথম সপ্তাহে ২০-বালুচকে ই.পি.আর, হেডকোয়ার্টার পিলখানায় পাঠানো হয়। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিলো পাঁচ হাজার ই.পি.আর-কে নিরস্ত্রীকরণ করা এবং তাদের ওয়ারলেস কেন্দ্র দখল করা।

ঘ. ৩২-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দায়িত্ব ছিলো রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বাঙালি পুলিশদের নিরস্ত্রীকরণ করা।

ঙ. ১৮-পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিলো নওয়াবপুর এলাকায়, মনে করা হয়েছিলো পুরনো ঢাকার অনেক হিন্দু বাড়িই অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছিলো।

চ. ফিল্ড রেজিমেন্টকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো দ্বিতীয় রাজধানী এবং মোহাম্মদপুর মীরপুর এলাকার দায়িত্বে।

ছ. ১৮-পাঞ্জাব, ২২-বালুচ এবং ৩২-পাঞ্জাব থেকে এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল বিশেষ বাহিনী, যাদের দায়িত্বে ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, বিশেষ করে ইকবাল হল এবং জগন্নাথ হল, মনে করা হয়েছিল এ দুটি হল আওয়ামী লীগ বিদ্রোহীদের দুর্গ।

জ. এক ট্রুপ বিশেষ প্লাটুন (কমান্ডো) মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করবে এবং তাঁকে জীবিত বন্দী করবে।

ঝ. এম-২৫ ট্যাঙ্ক বাহিনী শক্তি প্রদর্শনের কারণেই সকাল বেলা বেরুবে। প্রয়োজন হলে আক্রমণ চালাবে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হয় পাকিস্তান বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ। রাত দশটার কিছু আগে সাঁজোয়া, গোলন্দাজ এবং পদাতিক বাহিনীর আনুমানিক তিনটি ব্যাটেলিয়ন ক্যান্টনমেন্ট এলাকা অতিক্রম করে ফার্মগেটের দিকে অগ্রসর হয়। ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফার্মগেটের দূরত্ব এক কিলোমিটার। ফার্মগেটের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয় প্রথমে। ব্যারিকেড তৈরি করছিল সাধারণ মানুষ। গাছের গুঁড়ি, গ্যাস পাইপ, পুরনো গাড়ি, অকেজো স্টীম রোলার, কংক্রিটের নল দিয়ে তৈরি ব্যারিকেডের সামনে জনতা স্লোগান দিচ্ছিলো 'জয় বাংলা'। মুহূর্তে গর্জে উঠলো মেশিনগান। গুলি-বর্ষণে নিহত হলো ছাত্র-জনতা।

এগিয়ে চলে সেনাবাহিনী। ঢাকার রাজপথে সদম্ভ, শক্তিমত্ত প্রকাশ। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একযোগে আক্রমণে আকাশে হাউই বাজির মতো উড়ে যায় আগুনের ফুলকি। তখন সৈন্যরা ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি দখল

করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় শেল নিক্ষেপের জন্য ঐ জায়গাকে 'ফায়ার-বেস' হিসেবে ব্যবহার করে। মুখ থুবড়ে পড়ে যান গোবিন্দচন্দ্র দেব, এ.এন.এম. মনিরুজ্জামান, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা-সহ আরো অনেকে। রকেট লাঞ্চারের আঘাতে বিধ্বস্ত হয় ইকবাল হল, জগন্নাথ হল। দাউদাউ জ্বলে ওঠে বাবুপুরা বস্তি। ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ পালাতে চায়, পারে না। বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে বুলেট।

বঙ্গবন্ধুকে যখন জীপে করে ক্যান্টনমেন্টের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন সৈন্যরা তার বাড়ি তছনছ করে। সমস্ত নথিপত্র নিয়ে নেয়, সামনে যা পায় তা ভাঙচুর করে এবং সবুজের ওপর লাল সূর্য এবং হলুদে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত পতাকা মাটিতে ফেলে দেয়।

তখন এই পতাকার জন্য ঘাড়ে বুলেট নিয়ে বাসভবনের গেটের সামনে ঘাসের উপর শুয়ে কাতরাতে থাকেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ডাকেন, বাসন্তী-দোলা।

তখন এ.এন.এম. মনিরুজ্জামানের স্ত্রী তিনতলা থেকে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার গলার আওয়াজ শুনে পানি নিয়ে নিচে নামছিলেন। জানতেন না তাঁর স্বামী, পুত্র তখন রক্তের বন্যায় ভাসছেন। তিনি মনে করেছিলেন ওদের বন্দী করে নিয়ে গেছে। কিন্তু "নীচে নামতেই দেখতে পেলেন এক ভয়াবহ দৃশ্য। মনিরুজ্জামান সাহেবের ষোল বছরের ছেলের তখন অন্তিম মুহূর্ত। সে কষ্টে বলেছিল 'মা পানি দাও।' মুখে পানি দেবার পর সে একমুখ হাসি নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ছেলের পাশে পড়েছিলেন মনিরুজ্জামান সাহেব, তাঁর প্রায় ত্রিশ বছর বয়স্ক ছোটভাই এবং ১৪ বছরের ভাগনেটি। এই চারজন শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে হেঁটে যেয়ে মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী জ্যোতির্ময় বাবুর মুখে পানি দেন।"

তখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা গণকবর খুঁড়তে থাকেন সহপাঠীদের জন্য। সহপাঠী ও অন্যান্যদের লাশ টানতে টানতে পাগল হয়ে যান কালীরঞ্জন শীল। "কতগুলো লাশ এভাবে বহন করেছি ঠিক মনে নেই। শেষ যে লাশটা টেনেছিলাম তা ছিলো দারোয়ান সুনীলের। ... সামনেই দেখি ড.

গোবিন্দ দেবের মৃতদেহ। ধুতি পরা, খালি গা। ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত সারা শরীর। পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। আমার সাথে যে ছেলেটি লাশ টানছিল সে গোবিন্দ দেবের লাশটি দেখে বলল, 'দেবকেও মেরেছে! তবে আমাদের আর মরতে ভয় কি!' কি ভেবে, আমি দেবের লাশের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সুনীলের লাশসহ শুয়ে পড়লাম।" সেদিন এভাবেই বেঁচে গিয়েছিলেন জগন্নাথ হলের কালীরঞ্জন শীল।

তখন ইকবাল হলের প্রতিটি ঘর তছনছ করে ফেলা হচ্ছে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে হল। কামানের গোলা, রকেট লাঞ্চার, গ্রেনেড ইত্যাদির সঙ্গে ছুটে আসছে এক ধরনের আগুনে-বোমা। বোমাগুলো জানালা দিয়ে ঢুকে ঘরের ভিতর পড়তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরে। এতকিছুর মোকাবেলা করছে ছাত্ররা থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে। কিন্তু কতক্ষণ? আকাশে উড়ছে লাল নীল রঙের সন্ধানী ফানুস। তখন ওয়ারলেস সেটে শোনা গেলো ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। বলছে, আমরা ইকবাল হল থেকে বেশ বাধা পাচ্ছি। এপাশ থেকে গর্জে উঠলেন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা : তোমাদের কতক্ষণ লাগবে এলাকা দখল করতে? উত্তর এলো, চার ঘণ্টা। চার ঘণ্টা? ননসেন্স। কি অস্ত্র তোমরা ব্যবহার করছো? উত্তর এলো, রকেট লাঞ্চার, রিকোয়েলেস রাইফেলস, মর্টারস ... । এদিক থেকে নির্দেশ গেলো, ঠিক আছে সব ব্যবহার করে দু ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করো। ভোররাত চারটার দিকে থেমে গেলো শব্দ। সব শেষ, প্রাঙ্গণে, ঘরে বারান্দায়, ছাদে, পুকুর পাড়ে পড়ে রইলো অসংখ্য লাশ।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওরা পোড়ালো কালো পতাকা এবং বাংলাদেশের পতাকা। এই পতাকার জন্য লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কিছুতেই উচ্চারণ করেননি ওদের শেখানো বুলি। "তখন ওরা আবার ওর নাম ধরে জিজ্ঞেস করে বললো, তোমহারা নাম কিয়া? উনি নির্ভীক চিত্তে বললেন, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। আবার ওরা বললো–'বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' কিন্তু একটা আঙ্গুল তুলে তিনি তাঁর শেষ বাণী উচ্চারণ করলেন 'একদফা জিন্দাবাদ'। সাথে সাথে গুলি করলো পিশাচ

জালিমরা, উনি পড়ে গেলেন।" তাঁকে দুপা দুহাত ধরে দোলাতে দোলাতে জীপে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলো সৈনিকরা।

এভাবেই সাধারণ মানুষও গেছে। যারা রাজনীতির বেশি কিছু বোঝে না, কিন্তু মিছিলে সভায় যোগ দিয়ে আন্দোলনে প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করে, তারা নিউ মার্কেটে গুলি খেয়ে তরকারির ঝুড়ির উপর মাথা কাত করে পড়ে রইলো। কত শত সাধারণ মানুষ গুলি খেয়ে উঠতেই পারলো না। লাশের শহরে পরিণত হলো ঢাকা।

পরদিন পুরনো ঢাকায় তৈরি করা হলো নরক। দাউদাউ পুড়ছে শাখারীবাজার, ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, নাজিরাবাজার, নয়াবাজারসহ আরও অসংখ্য জায়গা। যারা পালাবার চেষ্টা করলো তারা গুলিবিদ্ধ হলো, যারা ঘরে থাকলো তারা পুড়ে কয়লা হলো।

বিকেলে জ্বলে উঠলো 'ইত্তেফাক'। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেলো ঢাকার আকাশ।

২৬ তারিখ সকালে সেনাবাহিনী যখন জানালো যে ঢাকা বিজয় সম্পন্ন হয়েছে তখন টিক্কা খান সোফা ছেড়ে অফিস ঘরে ঢুকলেন। সময় ৫টা। দিনের আলো ফুটতেই ব্রিগেডিয়ার আরবার জুলফিকার আলী ভুট্টোকে হোটেল থেকে নিয়ে নিরাপদে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেয়ার জন্য রওনা হলেন। বিমানে ওঠার আগে ভুট্টো সপ্রশংস দৃষ্টিতে ব্রিগেডিয়ার আরবারের দিকে তাকালেন। বললেন, গতরাতের হত্যাযজ্ঞ সেনাবাহিনীর একটি স্মরণীয় বিজয়। আরবারের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, Thank God, Pakistan has been saved. করাচি পৌঁছেও তিনি এই একই কথা উচ্চারণ করলেন।

সিদ্দিক সালিক লিখেছেন : 'দুপুরের খাবারে জন্য আমি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলাম। দেখলাম এখানে পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। শহরের বিপর্যয় সামরিক কর্মকর্তা এবং তাদের তল্পিবাহকদের স্নায়ু শীতল করে দিয়েছে। প্রবল ঝড়ের পর তারা দেখতে পেলো মুক্ত দিগন্ত। কর্মকর্তারা অফিসার্স মেসে বসে আয়েশের সঙ্গে গল্পগুজব করছিল। কমলালেবুর খোসা ছিলতে ছিলতে ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন, 'এই জীবনের মতো বাঙালিদের উচিত শিক্ষা দেয়া হয়েছে।' মেজর মালিক তার সঙ্গে যোগ করে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই। তারা শুধু জানে বলপ্রয়োগের ভাষা। তাদের ইতিহাস এরকমই বলে।'

তখন প্রখ্যাত সাংবাদিক সাইমন ড্রিংয়ের রিপোর্ট এমন :
"ভোরের কিছু আগে গুলিবর্ষণ থেমে গেল, এবং সূর্য ওঠার সাথে সাথে এক ভীতিজনক নিঃশব্দতা শহরের ওপর চেপে বসলো, ফিরে আসা দু'তিনটি ট্যাংকের শব্দ, মাঝে মাঝে কনভয়ের শব্দ ও কাকের চিৎকার ছাড়া সম্পূর্ণ শহর মনে হচ্ছিল পরিত্যক্ত এবং মৃত।"

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন তা এমন :

"I, Major Zia, Provisional commander-in-chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh. I also declare, we have alredy framed a soverign, legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution ..."

ছোট্ট বন্ধুরা, শুরু হয় স্বাধীনতার জন্য বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ।

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। সরকারের রাষ্ট্রপতি হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকার কারণে তাঁর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ। তাজউদ্দিন আহমদ তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও প্রজ্ঞায় পরিচালনা করেন তাঁর প্রবাসী সরকার।

পুরো দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডারের অধীনে পরিচালিত হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী। বাংলার আপামর জনসাধারণ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অসম সাহসী বাঙালি জীবনপণ লড়াই করে স্বাধীন করে দেশ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। এই জনযুদ্ধ সফল হয়েছে নারী-পুরুষের সর্বাত্মক ত্যাগ ও সহযোগিতায়। পুরুষরা যেমন অংশগ্রহণ করেছেন যুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তেমনি নারীরাও অংশগ্রহণ করেছেন যুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে। শহীদ হয়েছেন ত্রিশ লক্ষ মানুষ।

মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দান করে প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। পৃথিবীর মানচিত্রে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা জেনে রাখ, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জীবনের এক অবিনাশী সময়। শুধু বাঙালির নয়, সমগ্র মানবসমাজের মুক্তির ইতিহাসে এই সময় এক উজ্জ্বল অধ্যায়। আর এই অধ্যায়ের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বাঙালি এই স্বপ্নে উজ্জীবিত হয়ে একাত্তরে একটি জনযুদ্ধ সফল করে। তাই আমরা পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন জাতি। আমাদের গৌরব এবং স্বপ্ন দিয়ে আমরা এই দেশকে গড়ে তুলব।

তথ্যসূত্র

১. প্রথম বিজয় দিবস বার্ষিকী উপলক্ষে
স্মারকগ্রন্থ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২;
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
২. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল : সিদ্দিক সালিক
ভাষান্তর : মাসুদুল হক (ইংরেজি নাম : উইটনেস টু সারেন্ডার)
৩. বাংলাবাজার পত্রিকা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৫।
৪. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
বেলাল মোহাম্মদ
অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৩।
৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র
সম্পাদক-হাসান হাফিজুর রহমান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮৪।

ISBN 984410474-2
9 789844 104747

" সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করুন "
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির পুরস্কারের জন্য মুদ্রিত
বিক্রির জন্য নয়